For Core Course 6th Sem- DSE 4 & Programme Course 6th Sem -DSE

কল্পবিজ্ঞান / অধ্যাপক অদিতি চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের একটি ধারা যেখানে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির নানা তত্ত্ব, তথ্যকে নিজের কল্পনায় রাঙিয়ে এক ধরনের কাল্পনিক সাহিত্য রচনা করা হয়, তাকে Science fiction বলে। এই বিশেষ সংরূপটিতে সুদূর ভবিষ্যত বা সুদূর অতীতে পৌঁছনো, মহাকাশযানে ভিন গ্রহে যাত্রা, ভিন গ্রহের কাল্পনিক প্রাণীর আগমন, সমান্তরাল সৌরজগত ইত্যাদি বিষয় আসে। পাশ্চাত্য সায়েন্স ফিকশনের বিখ্যাত লেখক আইজাক এসিমভ বলেনঃ 'Science fiction can be defined as that branch of literature which deals with the reaction of human beings to changes in science and technology. (How easy to see the future!, Natural history, 1975)। অর্থাৎ, যে সাহিত্যে মানুষ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সেই সাহিত্য হল সায়েন্স ফিকশন।

পাশ্চাত্যের সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণাঃ পাশ্চাত্যে সায়েন্স ফিকশন কাহিনির রচয়িতা রোমাণ্টিক কবি শেলীর স্ত্রী মেরি শেলি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি *Frankenstein* ফ্রাঙ্কেস্টাইন লেখেন। তখনো সায়েন্স ফিকশন পরিভাষাটি অজানা ছিল। ফ্রাঙ্কেন্সটাইন প্রকাশের ৩৩ বছর পর উইলিয়াম উইলসন তাঁর *A Little Earnest Book upon a Great Old Subject* নামক একটি প্রবন্ধের বইতে প্রথম Science Fiction পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হ্যুগো গার্নসব্যাক বিজ্ঞান সম্পর্কিত পত্রিকা *Science Wonder Stories* প্রকাশ করেন। সেই সময় ওই পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলির চরিত্র বোঝাতে গিয়ে সায়েন্স ফিকশন পরিভাষাটি আবার ব্যবহার করলেন। তখন থেকেই পরিভাষাটির ব্যাপক প্রচার হল।

এডগার এলেন পোর *The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall* (1835) চাঁদে যাবার গল্প, জুল ভার্নের *Twenty Thousand Leagues Under the Sea* (1870), এইচ জি ওয়েলসের *The Time Machine* (1895), *The Island of Doctor*

Moreau (1896), *The Invisible Man* (1897), *The War of Worlds* (1898) সায়েন্স ফিকশনের জগতে সাড়া জাগানো উপন্যাস। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জন ডাব্লিউ ক্যাম্পবেল *Astounding Science Fiction* পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার পর পাশ্চাত্যে সায়েন্স ফিকশনের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ আমেরিকান সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানী আইজ্যাক এসিমভ তাঁর *Foundation Series* রচনা শুরু করেন, যেটি খুবই বিখ্যাত হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সায়েন্স ফিকশনের নতুন ঢেউ নিয়ে আসেন পোলান্ডের স্তানিস্লাভ লেমের মতো সায়েন্স ফিকশন রচনাকাররা। তাঁর উপন্যাস *Solaris*-এ সায়েন্স ফিকশনে বিষয় এবং গঠন দুই ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্ক হারবার্টের *Dune* নিউ ওয়েভ সায়েন্স ফিকশনের আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যের চীনে একবিংশ শতাব্দীতেও রচিত হয়ে চলেছে নানা ধরনের সায়েন্স ফিকশন।

কল্পবিজ্ঞান পরিভাষাঃ বাংলায় সায়েন্স ফিকশনের ভাবানুবাদ করা হয়েছে কল্পবিজ্ঞান। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অদ্রীশ বর্ধন প্রথম তাঁর সম্পাদিত *আশ্চর্য* নামক ম্যাগাজিনে সায়েন্স ফিকশনের বাংলা পরিভাষা হিসেবে কল্পবিজ্ঞান পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক পর্বে তিন ধরনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত আখ্যান ছিলঃ ১। বিজ্ঞাননির্ভর ২। বিজ্ঞানভিত্তিক ৩। বিজ্ঞান এবং রহস্য মিশ্রিত আখ্যান। এই সব ধরনের গল্প বাংলা কল্পবিজ্ঞান পরিভাষার সীমা আত্মস্থ করে নিতে পারে। উপরন্তু, বিজ্ঞান নির্ভর কাল্পনিক প্রবন্ধও কল্পবিজ্ঞান হতে পারে। ফলে বাংলা কল্পবিজ্ঞান পরিভাষার সীমা সায়েন্স ফিকশনের থেকে অনেক প্রসারিত। বাংলা কল্পবিজ্ঞানে কল্পনায় পরিবর্তিত সুদূর অতীত বা ভবিষ্যত্যের পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ যেমন আছে, তেমনি বিভিন্ন ধর্মে যে প্রচলিত বিশ্বাস এবং পুরাণের গল্পও কল্পবিজ্ঞানের সীমায় চলে আসে। তাই আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির বাইরের জগতের মধ্যে বিশ্বাসের স্ববিরোধিতা বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসঃ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ ৬ জুন প্রথম *The Calcutta Literary Gazette* পত্রিকায় কৈলাশ চন্দ্র দত্ত রচিত *A Journal of Forty Hours of the Year 1945* প্রথম কল্পবিজ্ঞানের আলোয় দেখা ইতিহাস বলা যেতে পারে। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে *The Saturday Evening Harakuru* পত্রিকায় আর এক বাঙালি শশীচন্দ্র দত্তের *The Republic of Orissa: page from the Annals of the Twentieth Century* এবং ১৮৬২

খ্রিস্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* এমনই দুটি রচনা। এরপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে *বিজ্ঞান দর্পণ* পত্রিকায় হেমলাল দত্তের লেখা *রহস্য* নামক গল্পে আধুনিক যন্ত্রের আবিষ্কার নিয়ে কথা বললেও, যা নেই তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার কথা বলতে পারে নি বলে একে যথার্থ কল্পবিজ্ঞান বলা যাবে না। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জগদানন্দ রায়ের লেখা প্রবন্ধ *শুক্র ভ্রমণকে* প্রথম কল্পবিজ্ঞান সম্মত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। স্বপ্নের মধ্যে বক্তা গল্পচ্ছলে নানা বৈজ্ঞানিক ধারণার উদ্ভাবন ঘটান এই প্রবন্ধে। তাঁর ভিনগ্রহের প্রাণীদের ঘন রোমশ বড় মাথার এবং দীর্ঘ নখের আদিমানবের মতো দেখতে। মনে পড়ে যাবে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী সাহিত্যিক Eyraud, Achille এর রচিত *Voyage à Vénus* (Voyage to Venus) এর কথা, যেখানে খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন মহাকাশযানে চেপে শুক্র গ্রহে ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে। এরপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু লেখেন *নিরুদ্দেশের কাহিনী*, যেখানে একশিশি তেল বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে বিধ্বংসী তুফান আটকে গোটা জাহাজকে প্রাণে বাঁচান গল্পের বক্তা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর *অব্যক্ত* নামক সংকলনে গল্পটিকে আরো বাড়িয়ে 'পলাতক তুফান' নামে প্রকাশ করেন এবং প্রথম ভাগের উপশিরোনামে রাখেন 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। সেই সময় থেকে এটি কল্পবিজ্ঞানের একটি সংরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর বেগম রোকেয়া প্রথম মহিলা যিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *Indian Ladies Magazine* পত্রিকায় 'Sultana's Dream' নামে একটি ছোট উপন্যাস লেখেন। এটি প্রথম নারীবাদী কল্পবিজ্ঞান সম্মত উপন্যাস বলা যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এটি *সুলতানার স্বপ্ন* নামে বাংলায় অনূদিত হয়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং আখ্যান সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশু ও কিশোর সাহিত্য পত্রিকা *সন্দেশ, মৌচাক, রংমশাল, রামধনু* ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কল্পবিজ্ঞান নির্ভর সাহিত্য গড়ে উঠল। সুকুমার রায় *সন্দেশ* পত্রিকায় 'হেসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি' লিখলেন, যেটি আর্থার কনান ডয়েলের *The Lost World* কে ব্যঙ্গ করে লেখা। বা লিখছেন গল্পচ্ছলে লেখা প্রবন্ধ 'শনির দেশ'।

কয়েকজন কল্পবিজ্ঞান লেখক ও সাময়িক পত্রঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্রঃ *রামধনু* এবং *রংমশাল* পত্রিকাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র একাদিক্রমে *পিঁপড়ে পুরাণ* (১৯৩১), *পাতালে পাঁচ বছর* (১৯৩১), *কুহকের দেশে* (১৯৩১-৩২, মৌচাক), *পৃথিবী ছাড়িয়ে* (১৯৩৭), *উপন্যাস মনু দ্বাদশ* (১৯৬৪), *সূর্য যেখানে নীল* (১৯৮৮), এছাড়া ছোটগল্প

যুদ্ধ যখন থামল, পৃথিবীর শত্রু, কালাপানির অতলে, মঙ্গলবৈরী, করাল কর্কট, আকাশের আতঙ্ক, মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী, ময়দানবের দ্বীপ, শুক্রে যারা গিয়েছিল এর মতো কিশোরদের কল্পবিজ্ঞান। জীববিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কল্পনার প্রকাশ দেখা যায় *মশা* গল্পে। নিশিমারা মশার ডিম অবস্থায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে মশার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটান, যাতে মশার লালা সাপের বিষের থেকেও মারাত্মক হয়ে ওঠে। *কাঁচ* জার্মানি নাৎসি যুবক প্যাপেনের ইউরেনিয়াম খোঁজার তাড়নায় অ্যাংগোলায় যাত্রা এবং ঘনাদার বুদ্ধির জোরে পরাজিত হওয়ার গল্প। এই গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরমাণু বোমার ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। আবার *ফুটো* গল্পে মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনশন এর জটিল গণিতকে উপাদেয় কাহিনির ভাঁজে পরিবেশন করেছেন। রোমহর্ষক ভাবে প্রফেসর মিনোস্কির জটিল গণিত মুহূর্তের মধ্যে ঘনাদাকে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে দিয়েছিল। বৈঠকী আড্ডার ছলে মজার এডভেঞ্চারের গল্পগুলি বাংলার কিছু অসাধারণ কল্পবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। জাতের বিচারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীগুলি নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্যের সায়েন্স ফিকশনের সঙ্গে সমপঙক্তিতে রাখা যায় না। অনেক সময়েই উপাদান নিয়েছেন বিদেশী কাহিনী থেকে। যেমন *পিঁপড়ে পুরাণ* উপন্যাসে নিয়েছেন এইচ জি ওয়েলসের *The Empire of the Ants* ছোটগল্প থেকে দক্ষিণ আমেরিকার পটভূমি এবং মানুষদের উপর পিঁপড়েদের আক্রমণ। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিঁপড়েরা দানবাকৃতি এবং প্রযুক্তিতে পারদর্শী। ফলে বিদেশী কাহিনী থেকে উপাদান নিয়ে নিজের মতো করে কাহিনী নির্মাণ করেছিলেন লেখক। এডভেঞ্চার, হাস্যরসের মাধ্যমে কিশোরদের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ করার কাজ খুব চমৎকার ভাবে করেছিলেন প্রমেন্দ্র মিত্র। সর্বোপরি পরবর্তী কল্পবিজ্ঞান লেখকদের পথ দেখিয়েছিলেন তিনি।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ আর এক শিশু কিশোর সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছিলেন এইচ জি ওয়েলসের *The War of Worlds* (1897-98) দ্বারা প্রভাবিত *মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন* (১৯২৫-২৬, মৌচাক পত্রিকায়), এবং ১৯২৬-২৭ জুড়ে গল্পটির পরবর্তী অংশ *ময়নামতীর মায়াকানন,* যেটি আর্থার কোনান ডয়েলের *The Lost World* থেকে উপাদান নিয়ে রচনা। *দ্য ওয়ার অব ওয়ার্ল্ডস* উপন্যাসে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল। হেমেন্দ্রকুমারের গল্পে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর মানুষ এবং সামগ্রী মঙ্গল নিজেদের গ্রহে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পৃথিবীবাসীদের মহাকাশযানে বন্দী করে ফেলে। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে লেখক বিজ্ঞানীদের নানা গবেষণা পড়েছিলেন। ষোড়শ পরিচ্ছেদে ‘জোড়া চাঁদের

মুল্লুকে' অধ্যায়ের পাদটীকায় তিনি নিজেই সে তথ্য দিয়েছেন। *ময়নামতীর মায়াকানন* উপন্যাসে মঙ্গল গ্রহ থেকে মহাকাশযান পৃথিবীর দিকে রওনা দিয়ে এসে পড়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রাগৈতিহাসিক জীব অধ্যুষিত এক দ্বীপে। সেখানে প্রকাণ্ড ফড়িং, সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে আসা ডিপ্লোডোকাস, মাংশাসী দু'পেয়ে ডাইনোসরের আক্রমণ, বনমানুষ আর মানুষের মিসিং লিঙ্ক প্রাণীর আক্রমণ, খাঁড়া দেঁতো বাঘের হাতে হাতির পর্যুদস্ত হওয়ার রোমহর্ষক ঘটনায় ভরা। গল্পে অতিকায় শ্লথ ডানাবিহীন হাঁসও দুঃস্বপ্নের মতো ভয় ধরায়। শেষে অভিযানকারীদের উদ্ধার করে এক ইউরোপীয় জাহাজ। ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (১৯৩৯), অমানুষিক মানুষ (১৯৫০) লেখকের আরো দুটি জনপ্রিয় গল্প।

ষাট থেকে আশির দশকে দু'জন বাঙালি বিজ্ঞানের অধ্যাপক কল্পবিজ্ঞানের জগত তাদের নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্পে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তারা হলেন সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট প্রফেসর শঙ্কু এবং অদ্রীশ বর্ধনের প্রফেসর নাটবল্টু চক্র।

অদ্রীশ বর্ধনঃ বাংলা কল্পবিজ্ঞানের জগতে অদ্রীশ বর্ধনের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি এই বিশেষ সংরূপটিকে জনপ্রিয় এবং পরিণত রূপ দিয়েছিলেন। ২০০৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র* অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সংকলন। পঞ্চাশটিরও বেশি বই তিনি লিখেছিলেন। *আশ্চর্য* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এইচ জি ওয়েলসের টাইমমেশিন অনুবাদ করেন তিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে মিলে তিনি সায়েন্স ফিকশন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৌলিক কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীঃ *প্রফেসর নাটবল্টু সমগ্র, গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র, অমানুষিকী, পাতায় পাতায় রহস্য, মিলকগ্রহে মানুষ* ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি হলঃ *রোনা, কালোচাকতি, সাগর দানব, বেলুন, পাহাড়ের বিচিত্র কাহিনী, রঙিন কাঁচের জঙ্গল, উল্কা, বৈজ্ঞানিক কুমারটুলি, মলিকিউল মানুষ, হাঙরের কান্না* ইত্যাদি। *হাঙরের কান্না* গল্পে সুজিতের জামাইবাবু ফরেস্ট অফিসার, যে বনের নেকড়েদের ট্রাণকুইলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গলায় রেডিও ট্রান্সমিটার লাগিয়ে রেডিও ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপর এক গা ছমছমে পরিবেশে নেকড়েকে অনুসরণ করতে করতে সুজিত আর তার জামাইবাবু গিয়ে পড়ে এক বুড়ো বদমাশ বিজ্ঞানীর ডেরায়। তিন যুগ ধরে সে প্রজনন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছেন। জামাইবাবুর সঙ্গে নেকড়ের এবং সুজিতের সঙ্গে হাতির বিয়ে দিয়ে

নেকড়ে মানুষ ও গণেশের মতো প্রাণীর উদ্ভব ঘটাতে চান। তবে শেষ পর্যন্ত জামাইবাবুর বুদ্ধিতে তাদের মুক্তি ঘটে। অদ্রীশ বর্ধনের কাহিনীতে বিজ্ঞানের তত্ত্বের থেকে কল্পনাই বেশি।

সত্যজিৎ রায়ঃ বাঙালির সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র সত্যজিৎ রায়ের কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর প্রধান চরিত্র প্রফেসর শঙ্কু। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে *সন্দেশ* পত্রিকায় 'ব্যোম যাত্রীর ডায়রি' দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে *সন্দেশ* পত্রিকায় দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রফেসর শঙ্কু ও হাড়' উপন্যাসটি থেকে যথাযথ ভাবে শঙ্কু সিরিজ শুরু হয়। বই হিসেবে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ হয় *প্রফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও, প্রফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক, প্রফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য,* ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে *প্রফেসর শঙ্কু ও রোবু, প্রফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য, প্রফেসর শঙ্কু ও গোরিলা,* ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে *আশ্চর্য প্রাণী, স্বপ্নদ্বীপ, মরুরহস্য,* ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে *শঙ্কুর শনির দশা, হিপনোজেন,* ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে *একশৃঙ্গ অভিযান,* ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে *মহাকাশের দূত, নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো,* ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে *শঙ্কু ও আদিম মানুষ , শঙ্কুর পরলোক চর্চা,* ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে *শঙ্কু ও ফ্রাঙ্কেনস্টাইন* এবং তাঁর শঙ্কু সিরিজের উপন্যাস আরো অসংখ্য উপন্যাস।

গিরিডিবাসী ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ডাবল অনার্সসহ বিএসসি শঙ্কু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাপক। প্রফেসর শঙ্কু, তার বিড়াল নিউটন, চাকর প্রহ্লাদ, রোবট বিধুশেখর, প্রতিবেশী অবিনাশ বাবুকে নিয়ে জমে ওঠে কল্পবিজ্ঞানের গল্প। *ব্যোমযাত্রীর ডায়রি*তে সকলকে নিয়ে মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করেন শঙ্কু। তারপর মঙ্গলগ্রহের প্রাণীদের তাড়া খেয়ে টাফা নামক এক গ্রহে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারা। বঙ্কুবাবুর বন্ধু লেখেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সন্দেশ পত্রিকায়। অন্য গ্রহ থেকে নামা মহাকাশযান দেখে গ্রাম বাসীদের সেটিকে মন্দির ভেবে পুজো করা, ভিনগ্রহের প্রাণীটির স্বপ্নের মাধ্যমে হাবা নামে গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা মজা করা নিয়ে এই উপন্যাসটি। কখনো প্রফেসর শঙ্কু পৃথিবীর বুকে কুড়িয়ে পান আশ্চর্য গোলক, যেটি আসলে সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ টেরাটম। এই গ্রহের উন্নত জীবরা পৃথবীর সকলকে ধ্বংস করে দিতে চাইলে শঙ্কু বাধ্যত সব প্রাণীসহ গ্রহটি ধ্বংস করে দেন। আবার *প্রফেসর শঙ্কু ও ভূত* গল্পে শঙ্কুর মতো দেখতে এক ভূত আবির্ভূত হয়। শঙ্কু তাঁর উদ্ভাবিত নিও-স্পেক্টোগ্রাফের সাহায্যে জানতে পারেন, এই ভূত আসলে তাঁর চারশো বছর আগেকার পূর্বপুরুষ। আবার প্রফেসর শঙ্কু এক অত্যাধুনিক রোবট উদ্ভাবন ক'রে

জার্মান বিজ্ঞানীর শয়তান রোবট ধ্বংস করেন *প্রফেসর শঙ্কু ও রোবু* উপন্যাস। *প্রফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য*তে আবার সমুদ্রের তলদেশে খুঁজে পান অদ্ভুত লাল মাছ, যা আসলে অন্য গ্রহের প্রাণী। প্রফেসর শঙ্কু আবিষ্কার করেন এনাইহিলিন পিস্তল, যা মানুষকে মারবে না, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবিষ্কার করেন উপনিষদে বর্ণিত বৃক্ষ থেকে সপ্তপর্ণী থেকে সর্বরোগনাশক মিরাকিউরল বড়ি, অনিদ্রা দূর করার জন্য সমনোলিন, হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেম্ব্রেন যন্ত্র। এমনকি, আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বানিয়েছিলেন কম্পুডিয়াম মেশিন। আর শয়তানদের প্রাণে না মেরে হাঁচিয়ে মারার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন নস্যাস্ত্র। প্রয়োগ করলে চল্লিশ ঘন্টা ধরে মানুষ হাঁচতে থাকে। শঙ্কুর আবিষ্কৃত শ্যাঙ্কোভাইট নামক ধাতু মাধ্যাকর্ষণ এড়াতে পারে। এবং এই ধাতু দিয়ে তিনি মঙ্গলগ্রহে যাবার প্লেন বানিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের নির্মেদ গদ্য, ছবি, এবং কাহিনী মিলে প্রফেসর শঙ্কু ছাড়া বাঙালির কল্পবিজ্ঞানের জগত ভাবা যায় না।

পত্রপত্রিকাঃ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং আখ্যান সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশু ও কিশোর সাহিত্য পত্রিকা *সন্দেশ, মৌচাক, রংমশাল, রামধনু* ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কল্পবিজ্ঞান নির্ভর সাহিত্য গড়ে উঠল। সুকুমার রায় *সন্দেশ* পত্রিকায় 'হেসোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি' লিখলেন, যেটি আর্থার কনান ডয়েলের *The Lost World* কে ব্যঙ্গ করে লেখা। বা লিখছেন গল্পচ্ছলে লেখা প্রবন্ধ 'শনির দেশ'। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যও রামধনু সাহিত্য পত্রিকাতে অনেকগুলি কল্পবিজ্ঞানের গল্প লিখেছিলেন। মহাভারতের চরিত্র এবং মঙ্গল গ্রহের অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণীদের নিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ *রামধনু* পত্রিকায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন *মঙ্গল পুরাণ*। প্রাচীন যুগ এবং অনাগত সময়কে একসঙ্গে মিলিয়ে এই রচনাগুলি বাংলা কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন *ধুমকেতু*। রাজশেখর বসু, পরশুরাম ছদ্মনামে লিখলেন *উলটপুরাণ, গামানুষ জাতির কথা,* মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দার চোখ দিয়ে দেখা এই পৃথিবী *মাঙ্গলিক* (১৯৫৫), এবং *পরশপাথর* (১৯৪৮)। লীলা মজুমদারও লিখেছিলেন বাতাসে বানানো বাড়ির গল্প – *বাতাসবাড়ি* (১৯৮৪)।

কেবল সাহিত্য নয়, কল্পবিজ্ঞান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে অদ্রীশ বর্ধন, রণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাস এবং সুজিত ধরের সম্পাদনায়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

থেকে ১৯৭৬ খ্রি পর্যন্ত *আশ্চর্য* পত্রিকা, স্বল্পজীবি *ফ্যান্টাস্টিক* (১৯৭৫-১৯৭৬), *বিস্ময়* (১৯৮২ থেকে এখনো), এবং *কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান* (১৯৮১)। সত্যজিৎ রায় এবং লীলা মজুমদারের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত *সন্দেশ* পত্রিকাতে আবার কল্পবিজ্ঞানের জোয়ার দেখা গেল। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন গল্পের অনুবাদ, পুরোনো কল্পবিজ্ঞানের গল্প উপন্যাস পুনর্মুদ্রন, এবং সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার নিজে তো বটেই, সঙ্গে অদ্রীশ বর্ধন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অনীশ দেব, রণেন ঘোষ, অমিতানন্দ দাস, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়চৌধুরি, সমরজিৎ কর, গুরুনেক সিং প্রমুখ লেখকরা নিয়মিত এই কল্পবিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে লিখতে শুরু করলেন। মুস্তাফা সিরাজ অবতারণা করলেন বৈজ্ঞানিক চন্দ্রকান্তের। লিখলেন কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস *সাহারার সন্ত্রাস, পক্ষীরাজ* ইত্যাদি। রেডিওর জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরি, সত্যজিৎ রায় মিলে লিখলেন *সবুজ মানুষ*, যেটি ১৯৮১ সালে অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত বার্ষিক *ফ্যান্টাস্টিক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছিলেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প। বিমল করের *হারানো জিপের রহস্য* (১৯৭৯), *মন্দারগড়ের রহস্যময় জ্যোৎস্না* (১৯৯৫) তাঁর দুটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের উপন্যাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *নীলমানুষ* সিরিজের বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞানের গল্প, যেগুলি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *কিশোর কল্পবিজ্ঞান* সমগ্রতে প্রকাশিত হয়েছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *ভেলা* একটি চমৎকার কল্পবিজ্ঞান গল্প। এছাড়া *ভুতুড়ে ঘড়ি* (১৯৮৪) এবং *পাতালঘর* (২০০০) তাঁর আরো দুটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস।

বর্তমানে বাঙালি লেখকের ইংরেজিতে লেখা সাহিত্যধারায় কল্পবিজ্ঞান জায়গা পেয়েছে। অমিতাভ ঘোষের *The Calcutta Chromosome* (1995), শমিত বসুর *The GameWorld Trilogy* (2004-2007), এবং রিমি বি চ্যাটার্জীর *Signal Red* (2005) এবং *Black Light* (2010) উল্লেখযোগ্য। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে পদীপ ঘোষের সম্পাদনায় *কল্পবিশ্ব* নামে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়। এই পত্রিকার নেতৃত্বে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্র্যাকেনস্টাইন এর রচয়িতা মেরি শেলির ২০০ বছর পূর্তি পালন করা হয়।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের সামগ্রিক মূল্যায়নঃ

‘ভূতের গল্প যেন ভূতেদের জন্য নয়, ঠিক তেমনি কল্পবিজ্ঞানও বৈজ্ঞানিকদের জন্য নয়, এই আপ্তবাক্যটা মাথার মধ্যে রেখেই কল্পবিজ্ঞান রচনায় একনিষ্ঠ হয়েছিলাম ১৯৬৩ সাল

থেকে'—*প্রফেসর নাটবল্টু চক্র* সংগ্রহ বইয়ের ভূমিকায় এ ভাবেই অদ্রীশ বর্ধন জানিয়েছেন। বাস্তবেই বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের ধারায় বিজ্ঞানের গূঢ় তাত্ত্বিক উপস্থাপনা তেমন চোখে পড়ে না। বরং কাল্পনিক জগত ঘিরে রহস্য, মজা, এডভেঞ্চারের বা ভয়ের গল্প বেশি লেখা হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের *প্রফেসর শঙ্কু ও ইজিপ্সীয় আতঙ্ক* উপন্যাসে যখন মিরাকিউরল ওষুধের কথা বলা হচ্ছে, তখন শঙ্কু ওষুধের কোনো জৈবরাসায়নিক এবং জৈবপ্রযুক্তির দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছেন না। কেবল বলছেন, অনেক অদ্ভুত জিনিসের সংমিশ্রণে এই ওষুধ তৈরি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজও আসলে ঘনাদার মস্তিষ্কপ্রসূত। তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। *ধুলো* গল্পে ঘনাদা হারপুন কামানে সিলভার আয়োডাইড ভরে গোলা ছুড়ে ভয়াবহ সামুদ্রিক ঘূর্ণি থামিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে বিজ্ঞানসম্মত নয়, তা সেই আড্ডার আর এক সদস্য সুধীর পাঠকদের জানায়। এই গল্পগুলি যত না সায়েন্স ফিকশনের, তার থেকে অনেক বেশি এডভেঞ্চারের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীলমানুষ সিরিজেও গ্রহান্তরে গিয়ে দানবিক চেহারা পাওয়া নীলমানুষ এবং বন্ধু বামনাকৃতি গুটুলি ছাড়া কল্পবিজ্ঞানের আর কোনো রসদ নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা কল্পবিজ্ঞানের গল্পের তো বিশেষ অভাব বাংলায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু সায়েন্স ফিকশন সংরূপটিকে প্রাপ্তবয়স্কদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য সার্থক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন স্তানিস্লাভ লেমএর *সোলারিস* নামক বিখ্যাত উপন্যাসটিতে মৃত বা অতীত পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমানের মানুষদের যোগাযোগহীনতার সংকটের কথা বলা হয়েছে। ফলে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী কল্পবিজ্ঞানের অভাব বাংলা সাহিত্যে রয়েছে।

The Telegraph পত্রিকায় ১২ মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয় নিউ টাউন বইমেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের বাংলা কল্পবিজ্ঞান নির্ভর সাহিত্য সম্পর্কে ৫ মার্চের আলোচনা, যেখানে লেখক শৌভিক দাস এবং পার্থ দে, কল্পবিশ্ব পত্রিকার সম্পাদক দীপ দে এবং কল্পবিজ্ঞান নামক তথ্যচিত্রের পরিচালক ঋজু গাঙ্গুলির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। যেখানে শৌভিক দাস ব্যাখ্যা করেন, ভারতীয় পুরাণ কীভাবে সায়েন্স ফিকশনের কথা বলে। তাঁর মতে ব্রহ্মার চারটি মাথা আসলে অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের প্রতীক। বলরাম রেবতীর গল্প আসলে দুটি ভিন্ন সময়ের ভিন্ন বিশ্বের প্রাণীর মধ্যে ভালবাসার গল্প। কিন্তু এই ব্যাখ্যা খানিকটা কষ্টকল্পিত মনে হয়। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আরো অনেক পথ চলতে হবে নিঃসন্দেহে।